৫.৬ ভারতীয় দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি (Proofs for the Existence of God in Indian Philosophy)

৫.৬.১ ভূমিকা

মানুষ সাধারণভাবে ঈশ্বর বিশ্বাসী। এই বিশ্বাসের পক্ষে সে কোন যুক্তি খোঁজে না। কিন্তু দার্শনিকগণ যুক্তি প্রমাণ বিনা কোন বক্তব্য গ্রহণ করতে রাজি নন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকাংশ সম্প্রদায়ই ঈশ্বর স্বীকারের প্রয়োজন অনুভব করেননি। চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, সাংখ্য এবং মীমাংসকগণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। ব্যতিক্রম শুধু ন্যায়বৈশেষিক দর্শন ও যোগদর্শন। অবশ্য ন্যায় ও

বৈশেষিক দর্শনের আদি প্রবক্তাগণ মনোভাবের দিক থেকে সচেতনভাবেই নিরীশ্বরবাদী ছিলেন। পরবর্তীকালের ন্যায়-বৈশেষিকগণ যে ঈশ্বর স্বীকার করেন তা ধর্মীয় অনুভূতিকে যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলার জন্য নয় বরং করেন তাঁদের পরমাণু তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করার প্রকরণগত প্রয়োজন থেকেই। দুটি পরমাণু কিভাবে সংযুক্ত হয়ে দ্ব্যণুক সৃষ্টি করে এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করার জন্যই ঈশ্বর স্বীকার প্রয়োজন বলে তাঁরা মনে করেছিলেন। একবার ঈশ্বর স্বীকার করার পর এই ধারণা তার নিজস্ব গতি পেয়ে যায় এবং নানাভাবে বিস্তৃতি লাভ করে। আমরা প্রথমে ন্যায় দার্শনিকদের ঈশ্বর সংক্রান্ত ধারণা বিবৃত করব আর তারপর তাঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্বের সপক্ষে যে যুক্তি দিয়েছিলেন তা বিবৃত করব।

৫.৬.২ ন্যায় মত অনুসারে ঈশ্বরের স্বরূপ (Nature of God according to the Naiyayikas)

ন্যায়মতে, আত্মা হল জ্ঞান নামক গুণের আধার। নৈয়ায়িকগণ যে ২৪টি গুণ স্বীকার করেন জ্ঞান হল তারই একটি। এই জ্ঞান থাকে আত্মায়। আত্মা দুই প্রকার—জীবাত্মা ও পরমাত্মা। পরমাত্মাই ঈশ্বর। অনিত্য জ্ঞানের আধার যে দ্রব্য তা হল জীবাত্মা। নিত্য জ্ঞানের আধার যে দ্রব্য তা হল পরমাত্মা বা ঈশ্বর। জীবাত্মায় অনিত্য জ্ঞান ছাড়াও সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সংস্কার, ধর্ম ও অধর্ম—এই বিশেষ গুণগুলি এবং সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ ও বিভাগ—এই সামান্য গুণগুলিও থাকে।

পরমাত্মায় বা ঈশ্বরের সামান্যগুণগুলির অস্তিত্ব সম্বন্ধে ন্যায়বৈশেষিক দার্শনিকগণ একমত। কিন্তু বিশেষ গুণগুলির মধ্যে কোন্ কোন্ গুণ পরমাত্মায় আছে তা নিয়ে ন্যায়-বৈশেষিক দার্শনিকগণ একমত নন। ঈশ্বরের জ্ঞান নামক গুণ আছে এবং এই জ্ঞান নিত্য, সর্বপদার্থ বিষয়ক এবং প্রত্যক্ষাত্মক—এবিষয়ে তাঁরা সকলেই একমত। দুঃখ, দ্বেষ, সংস্কার, অধর্ম—এগুলি যে ঈশ্বরের নেই তা নিয়েও সকলে একমত। কিন্তু ইচ্ছা ও প্রযত্ন ঈশ্বরের আছে কি? বেশিরভাগ নৈয়ায়িক বলেন ঈশ্বর জগৎকর্তা। যিনি জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্নবান তিনিই কর্তা। সুতরাং, ঈশ্বরের ইচ্ছা ও প্রযত্ন আছে। অবশ্য ঈশ্বরের ইচ্ছা ও প্রযত্ন তাঁর জ্ঞানের মতোই নিত্য। কোন কোন নৈয়ায়িক বলেন ঈশ্বরের ইচ্ছা ও প্রযত্ন নেই। তাঁর জ্ঞানই ইচ্ছা ও প্রযত্নের কাজ করে। সুখ সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। জয়ন্ত ভট্ট বলেন ঈশ্বরের সুখ আছে এবং সে সুখ নিত্যসুখ। কিন্তু ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলেন ঈশ্বরের সুখ থাকতে পারে না। কর্মের ফল সুখ এবং দুঃখ। ঈশ্বরের কর্মফল নেই তাই সুখ-দুঃখও নেই। তাছাড়া, দেহ, ইন্দ্রিয় ব্যতীত সুখ-দুঃখের ভোগ হয় না। ঈশ্বরের দেহ ও ইন্দ্রিয় নেই। কাজেই তাঁর

সুখ-দুঃখও নেই। যে শ্রুতিতে ঈশ্বরের নিত্য সুখের কথা বলা হয়েছে তার লাক্ষণিক অর্থ করতে হবে। সুখ অর্থ দুঃখের আত্যন্তিক অভাব।

পরমাত্মা বা ঈশ্বর জগতের কারণ। ঈশ্বর হলেন জগতের নিমিত্ত কারণ, সমবায়ী বা অসমবায়ী কারণ নন। ঈশ্বরের ইচ্ছায় দুটি পরমাণুর সংযোগে একটি দ্ব্যণুক, তিনটি দ্ব্যণুকের সংযোগে একটি ত্র্যণুক, চারটি ত্র্যণুকের সংযোগে একটি চতুরণুক ইত্যাদি ক্রমে সূক্ষ্ম থেকে স্থূল, স্থূল থেকে স্থূলতর জাগতিক দ্রব্যসমূহ উৎপন্ন হয়। পরমাণুগুলি হচ্ছে তাদের সংযোগজনিত দ্ব্যণুক নামক দ্রব্যের সমবায়িকারণ, পরমাণুগুলির সংযোগ ঐ দ্রব্যের অ-সমবায়িকারণ, আর ঈশ্বর হচ্ছেন নিমিত্ত কারণ। ত্র্যণুকের ক্ষেত্রে দ্ব্যণুক তিনটি হচ্ছে সমবায়িকারণ ; ঐ দ্ব্যণুকগুলির সংযোগ হচ্ছে অ-সমবায়িকারণ, ঈশ্বরের ইচ্ছা নিমিত্ত কারণ। অর্থাৎ, জাগতিক সকল উৎপন্ন দ্রব্যেরই নিমিত্ত কারণ হলেন ঈশ্বর। অবশ্য ঈশ্বর ছাড়াও জগতের বস্তুসমূহের অন্যান্য নিমিত্ত কারণ আছে। যেমন জীবের অদৃষ্ট, দিক, কাল ইত্যাদি যে কোন জাগতিক বস্তুর নিমিত্ত কারণ। কিন্তু ঈশ্বর এই ধরনের নিমিত্ত কারণ নন। কুম্ভকার যে অর্থে ঘটের নিমিত্ত কারণ, তন্তুবায় যে অর্থে বস্ত্রের নিমিত্ত কারণ, ঈশ্বরও সেই অর্থে জগতের নিমিত্ত কারণ। কুম্ভকারকে ঘটরূপ কার্যের কর্তা বলা হয় ; তন্তুবায়কে বস্ত্রের কর্তা বলা হয় ; ঈশ্বরও কর্তারূপে জগতের নিমিত্ত কারণ। কর্তা বলতে কী বোঝায়? কোন কার্যের যিনি কর্তা হন তার ঐ কার্যের উপাদান কারণের প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকে, কার্য উৎপন্ন করার চিকীর্ষা বা ইচ্ছা থাকে এবং সে ব্যাপারে প্রবৃত্তি বা যত্ন থাকে। জাগতিক পদার্থসমূহের মূল উপাদান বা সমবায়িকারণ হচ্ছে পরমাণুগুলি। সব কিছুই ঈশ্বরের প্রত্যক্ষের বিষয়। কাজেই পরমাণুগুলিকেও ঈশ্বর প্রত্যক্ষ করেন। জগৎ সৃষ্টির ইচ্ছাও ঈশ্বরের আছে। জীব যাতে তার কর্মফল অনুযায়ী সুখ ও দুঃখ ভোগ করতে পারে, সেই ইচ্ছাতেই ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেন। সৃষ্টি কার্যের প্রবৃত্তি বা যত্নও ঈশ্বরের আছে। কাজেই ঈশ্বর জগৎকর্তা।

ঈশ্বরের জগৎসৃষ্টির ইচ্ছা অবশ্য জীবের কর্মফলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পূর্বজন্মে কৃতকর্মের ফল যাতে জীব ভোগ করতে পারে, সেজন্য উপযুক্ত জগৎ ঈশ্বরের ইচ্ছায় সৃষ্ট হয় ; জীবাত্মাও উপযুক্ত দেহের সঙ্গে যুক্ত হয়। কাজেই ঈশ্বরের ইচ্ছাকে স্বৈরাচারী ইচ্ছা বলা চলে না। ঈশ্বরের জগৎসৃষ্টির ইচ্ছা যদি জীবের অদৃষ্টের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হত, তাহলে এ সংসারে বিভিন্ন ব্যক্তির সুখ-দুঃখের যে তারতম্য তা ব্যাখ্যা করা যেত না। বলতে হত ঈশ্বরের খামখেয়ালিপনায় কেউ সুখী, কেউ দুঃখী। কিন্তু যিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, তিনি ঈশ্বরকে খেয়ালি পুরুষ বলে ভাবেন না, ভাবতে পারেন না। তিনি ন্যায়ের প্রতিমূর্তি। ন্যায়বিচার অনুযায়ী জীবের ভোগের

জন্যই ঈশ্বর এমন জগৎ সৃষ্টি করেছেন, যাতে প্রত্যেক জীব নিজের কর্মফল ভোগ করতে পারে।

ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টির জন্য জীবের কর্মফলের উপর নির্ভর করেন, একথায় মনে হতে পারে যে, জগৎ সৃষ্টির ব্যাপারে ঈশ্বরের পুরো কর্তৃত্ব নেই। সেক্ষেত্রে আর ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান বলা যায় না। সর্বশক্তিমান বলতে আমরা সাধারণত বুঝি এমন ব্যক্তি যার ইচ্ছা বা শক্তি কোনভাবেই ব্যাহত হয় না। কিন্তু জগৎসৃষ্টির ব্যাপারে যদি জীবের কর্ম অনুযায়ী ঈশ্বরের ইচ্ছা চালিত হয় তাহলে তাঁর ইচ্ছা আর অব্যাহত থাকে না।

নৈয়ায়িক উত্তরে বলেন, ঈশ্বরের ইচ্ছা জীবনের কর্ম অনুযায়ী চালিত হয়, এমন কথা না বলে বলা উচিত ঈশ্বর জীবের কর্মকে অনুগ্রহ করেন। একথার অর্থ হল—ন্যায়বৈশেষিক মতে জীবের কর্ম ও কর্মফলপ্রাপ্তি এই দুইই ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে। জীব যে কর্ম করে, তা ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই করে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে জীবকে কি আদৌ কর্তা বলা যাবে? নৈয়ায়িক বলেন, ঈশ্বরের ইচ্ছাতে জীব কর্ম করলেও তার কোন কর্তৃত্ব নেই একথা বলা চলে না। কর্মের প্রতি জীবের যে কর্তৃত্ব তা প্রযোজ্য কর্তৃত্ব, ঈশ্বরের কর্তৃত্ব প্রযোজক কর্তৃত্ব। ঈশ্বরের দ্বারা প্রযুক্ত হয়েই জীব কর্ম করে, কিন্তু রথ যেভাবে সারথির দ্বারা চালিত হয়, সেভাবে জীবের কর্ম ঈশ্বরের দ্বারা চালিত হয় না। রথ অচেতন পদার্থ ; জীবের রাগ, দ্বেষ ইত্যাদি আছে। তার নিজের ইচ্ছা ও প্রযত্ন হয়। কাজেই বলা উচিত জীবেরও কর্তৃত্ব আছে।

কিন্তু ঈশ্বর করুণাময়। তিনি জীবকে দুঃখজনক কর্মে প্রযুক্ত করেন কেন? নৈয়ায়িক বলেন ঈশ্বর জীবের পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্ম অনুযায়ী তাকে উত্তর উত্তর জন্মে কর্মে নিযুক্ত করেন। জীবের সব জন্মেরই পূর্ব জন্ম থাকে। সংসাদ অনাদি, কাজেই সর্বপ্রথম জন্ম বলে জীবের কোন জন্ম নেই। এই কারণেই ঈশ্বর সব কর্মের প্রযোজক কর্তা হয়েও জীবকে দিয়ে শুধুমাত্র সুখজনক কর্ম করাতে পারেন না। পূর্বজন্মের কর্মফল অনুযায়ী পরজন্মের কর্মে তাকে প্রযুক্ত করেন। কর্মফলের রোধ ঈশ্বর করতে পারেন না। কর্মের বিধান ঈশ্বরেরই ইচ্ছার প্রকাশ। তিনি এই বিধানকে লঙ্ঘন করবেন কেন? কাজেই জীবের অশুভ কর্মের ফল জীবকে ভোগ করতে হয়। কর্মফল ভোগ হলেই শেষ হয়ে যায়। ঈশ্বর করুণাময় বলেই অশুভ কর্মের ফলভোগ করিয়ে, ঐ ফল নাশের চেষ্টা করেন। এজন্যই বলা হয় ঈশ্বর জীবের কর্মকে অনুগ্রহ করেন। এই হল নৈয়ায়িকদের ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা।*

---

* ঋণ স্বীকার—অধ্যাপিকা করুণা ভট্টাচার্য, *ন্যায়বৈশেষিক দর্শন*, পৃষ্ঠা ৫৩-৫৫।

৫.৬.৩ নৈয়ায়িকদের ঈশ্বরের অস্তিত্বের সপক্ষে প্রমাণ (Proof for the existence of God by the Naiyayikas)

এর আগে আমরা ঈশ্বরের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করেছি। এবার আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্বের সপক্ষে যেসব প্রমাণ দিয়েছেন তা নিয়ে আলোচনা করব। নৈয়ায়িকগণ ঈশ্বরের অস্তিত্বের সপক্ষে চারটি প্রমাণ দিয়েছেন। এগুলি হল (ক) কার্যকারণ বিষয়ক প্রমাণ, (খ) অদৃষ্টভিত্তিক প্রমাণ, (গ) বেদকর্তারূপে প্রমাণ এবং (ঘ) আগম বা শ্রুতি প্রমাণ। আমরা এগুলি নিয়ে একে একে আলোচনা করব।

ক. কার্যকারণ বিষয়ক প্রমাণ

প্রতিটি কার্যের একটি কারণ থাকে। এই হল কার্যকারণ নিয়ম। নৈয়ায়িকগণের মতে, কার্য সৃষ্টির পূর্বে অসৎ। কারণকূট বা কারণসামগ্রীই কার্যকে উৎপন্ন করে। বিচিত্র বস্তু সমন্বিত এই জগৎ একটি কার্য। সুতরাং, এই জগতেরও একটি কারণ আছে। জগতের এই কারণই ঈশ্বর। প্রশ্ন করা যেতে পারে যে প্রতিটি কার্যেরই একটি কারণ আছে তা নৈয়ায়িকগণ জানলেন কী করে? আবার যদি স্বীকার করে নিই যে প্রতিটি কার্যেরই একটি কারণ আছে এটি একটি সার্বিক নিয়ম, তথাপি জগৎ যে একটি কার্য তার প্রমাণই বা কী? নৈয়ায়িকগণ বিভিন্ন দৃষ্টান্তের সাহায্যে অন্বয় প্রক্রিয়ার দ্বারা কার্যকারণের সার্বিক নীতিকে এবং অন্য বিবিধ যুক্তির সাহায্যে জগতের কার্যত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন।

আমরা সকলেই অনুভব করি যে ঘট, পট, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি বিবিধ কার্য কোন চেতন সত্তা ছাড়া উৎপন্ন হয় না। যখনই কোন ঘট বা কোন পট (বস্ত্র) বা কোন চেয়ার বা কোন টেবিল উৎপন্ন হয় তখনই তার কারণরূপে কোন একটি চেতন সত্তা থাকে। ন্যায়দর্শন অনুসারে একই ক্ষণে কারণ ও কার্য উভয়ই উৎপন্ন হতে পারে না। তাই কারণ সবসময়ই কার্যের পূর্ববর্তী হয়, সমসাময়িক হয় না। কার্যের চেতন কারণ ন্যায়মতে নিমিত্ত কারণের অন্তর্গত।

জগৎ যে কার্য তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য নৈয়ায়িকগণ দুটি হেতুর সাহায্য নিয়েছেন। এই দুটি হেতু হল সাবয়বত্ব এবং অবান্তর মহত্ত্ব। ন্যায়বৈশেষিক দর্শন অনুসারে নিরবয়ব পরমাণু এবং অতিমহৎ দেশকাল, আত্মা ইত্যাদি নিত্যদ্রব্য এগুলি কোনকিছুর কার্য নয়। কিন্তু ঘট, পট, চেয়ার, টেবিল, নদী, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি দেশকাল ইত্যাদির ন্যায় অতিমহৎ নয়। আবার ক্ষিতি, অপ, তেজ ও বায়ুর পরমাণুর মতো অণুপরিমাণও নয়। জাগতিক বস্তুগুলি সবই সাবয়ব এবং অবান্তর মহৎ অর্থাৎ, মধ্যম পরিমাণ বিশিষ্ট। সমস্ত সাবয়ব ও মধ্যম পরিমাণ বস্তুই কার্য। অতিসূক্ষ্ম পরমাণু কোন

কার্য নয় আবার অতিমহৎ দেশ, কাল, আকাশ, আত্মাও কোন কার্য নয়। একমাত্র যা মধ্যম পরিমাণ তাই কার্য। জগতের মধ্যম পরিমাণ বস্তুগুলিই কার্য। এই কার্যরূপ জগতের নিমিত্ত কারণ হিসেবে একটি চেতনসত্তা প্রয়োজন। কার্যের নিমিত্ত কারণরূপ চেতনসত্তা অবশ্যই কার্যের সূক্ষ্ম উপাদানের সুস্পষ্ট জ্ঞান, কার্য উৎপন্ন করার ইচ্ছা এবং কার্য উৎপন্ন করার ক্ষমতাসম্পন্ন হবেন। তা না হলে জড় উপাদান ও চেতন কর্তার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না। জগতের উপাদান সূক্ষ্ম পরমাণুগুলি এবং সহকারী কারণ দেশ, কাল ইত্যাদির জ্ঞান কোন সীমিত জ্ঞানের অধিকারী কোন চেতন কর্তার পক্ষে থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং, জগতের যিনি নিমিত্ত কারণ তাকে অসীম জ্ঞানের অধিকারী বা সর্বজ্ঞ হতে হবে। জগতের মতো বিরাট কার্য উৎপন্ন করার ইচ্ছা ও ক্ষমতা এক সর্বশক্তিমান সত্তার পক্ষেই থাকা সম্ভব। ঈশ্বরই একমাত্র সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। তাই ঈশ্বরই জগতের নিমিত্ত কারণ।

খ. অদৃষ্টভিত্তিক প্রমাণ

জীবের কর্ম থেকেই তার অদৃষ্ট অর্থাৎ পাপ ও পুণ্য উৎপন্ন হয়ে থাকে। জীব এই অদৃষ্ট অনুসারেই সুখ ও দুঃখ ভোগ করে। কিন্তু অদৃষ্ট হল অচেতন। কোন অচেতন পদার্থ চেতন কর্তার দ্বারা চালিত না হয়ে কার্য উৎপন্ন করতে পারে না। কাঠুরিয়ার দ্বারা চালিত না হয়ে কুঠার যেমন কাষ্ঠচ্ছেদন করতে পারে না, ঠিক তেমনি কোন চেতন কর্তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে অদৃষ্টও জীবের কর্ম অনুযায়ী ফল প্রদান করতে পারে না। এই চেতন কর্তা কোন জীব হতে পারে না, কারণ অদৃষ্টের ফল বিধান অদৃষ্টের জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। কোন জীবের পক্ষেই অসংখ্য জীবের অসংখ্য অদৃষ্টকে জানা সম্ভব নয় এবং সেই অদৃষ্টকে নিয়ন্ত্রণ করে সুখ-দুঃখের ব্যবস্থা করাও সম্ভব নয়। কাজেই জীবের অদৃষ্টের অধিষ্ঠিতা হিসেবে কোন সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান পুরুষ অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। এই পুরুষই ঈশ্বর।

গ. বেদকর্তা রূপে ঈশ্বর প্রমাণ

ভারতীয় দর্শনের আস্তিক সম্প্রদায়গুলি বেদপ্রামাণ্যে বিশ্বাসী। তাঁদের মতে বেদ অভ্রান্ত ও সর্বপ্রকার জ্ঞানের আকর। ন্যায়দর্শন মনে করে বেদের রচয়িতা কোন আপ্তপুরুষ বা ঈশ্বর। দৃষ্টার্থ বেদবাক্য থেকে বেদের প্রামাণ্য সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। আয়ুর্বেদ রোগ নিরাময়ের যে বিধান দেয় তা পালন করে রোগগ্রস্ত মানুষের রোগমুক্তি ঘটে থাকে। শুধু দৃষ্টার্থ বেদবাক্যই অভ্রান্ত নয়, অদৃষ্টার্থ বেদবাক্যও অভ্রান্ত। মানুষ সসীম জীব। তারপক্ষে বেদের সকল বাক্যের ব্যবহারিক প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে বেদের প্রামাণ্য বেদের রচয়িতার প্রামাণ্য থেকে নিঃসৃত। বহু

বেদবাক্য সাধারণ মানুষের বোধগম্যই নয়। সুতরাং, অতিশয় সূক্ষ্ম ও অতীন্দ্রিয় পদার্থবিষয়ক বেদবাক্য কোন সসীম মানুষের রচনা হতে পারে না। এরূপ বেদবাক্য কোন সর্বজ্ঞ পুরুষের দ্বারাই সম্ভব হতে পারে। সর্বজ্ঞানের আকর হল বেদ। এই বেদ একমাত্র ঈশ্বরের দ্বারাই রচিত হতে পারে।

ঘ. ঈশ্বরের অস্তিত্ববিষয়ে আগম বা শ্রুতি প্রমাণ

ঈশ্বর অস্তিত্বশীল কারণ শ্রুতিতে তাঁর অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে। যেমন বৃহদারণ্যক উপনিষদে (Upanisad of the Great Forest–8.8.22) বলা হয়েছে—"যিনি প্রাণসমূহের মধ্যে বিজ্ঞানময়, তিনি হৃদয়ের মধ্যে এই আকাশে অবস্থিত, তিনি মহান অজ, আত্মা, তিনি সকলের বশী, সকলের শাসনকর্তা ও সকলের অধিপতি। সাধু কাজের দ্বারা তিনি মহৎ হন না, অসাধু কাজের দ্বারাও হীন হন না। ইনি সর্বেশ্বর, সর্বভূতের অধিপতি, পালক। লোকসমূহ যাতে বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায়, এজন্য তিনি সেতুস্বরূপ এবং ধারণকর্তা হয়ে রয়েছেন।"* উপনিষদ থেকে এরূপ বাক্য আরো উদ্ধৃত করা যায়। শ্রীমদভগবদ্‌গীতাতে (নবম অধ্যায়) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

'পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ।।১৭
গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাস শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্।।১৮

অর্থাৎ আমিই এই জগতের পিতা, মাতা ও সর্বপ্রাণীর কর্মফলদাতা, পিতামহ, এবং একমাত্র জ্ঞেয় ও পরিশুদ্ধিকর বস্তু। আমিই ওঙ্কার এবং আমিই ঋগ্‌বেদ, সামবেদ ও যজুর্বেদস্বরূপ। আমিই প্রাণীর পরাগতি ও পরিপালক। আমি সকল প্রাণীর বাসস্থান ও তাদের কৃতাকৃতের সাক্ষী। আমিই রক্ষক ও প্রত্যুপকার নিরপেক্ষ হিতকারী। আমিই স্রষ্টা ও সংহর্তা। আমিই আধার ও প্রলয়স্থান এবং আমি জগতের অক্ষয় কারণ।

এইসব শ্রুতিবাক্য ঈশ্বরের অস্তিত্বের সাক্ষ্য বহন করে। শ্রুতি যদি অভ্রান্ত হয় তাহলে এইসব উক্তি থেকে নিশ্চিতভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

বেদকর্তারূপে ঈশ্বর প্রমাণ এবং শ্রুতিপ্রমাণ সম্পর্কে আপত্তি হতে পারে যে এই দুটি প্রমাণ অন্যোন্যাশ্রয় দোষযুক্ত (fallacy of petitio principi)। পরস্পরের উৎপত্তি, স্থিতি বা জ্ঞানে যদি পরস্পরের অপেক্ষা থাকে তাহলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়। একটি যুক্তিতে নৈয়ায়িকগণ বেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য বেদ ঈশ্বরসৃষ্ট

* অতুল চন্দ্র সেন কৃত অনুবাদ।

বলেছেন আর অন্য যুক্তিতে ঈশ্বরকে বেদ নির্ভর বলা হয়েছে। অর্থাৎ, বেদ নির্ভর করে ঈশ্বরের উপর আবার ঈশ্বর নির্ভর করে বেদের উপর। ঈশ্বর এবং বেদ পরস্পরের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় অন্যোন্যাশ্রয় বা পরস্পরাশ্রয় দোষ হয়েছে।

নৈয়ায়িকগণ এই আপত্তি খণ্ডন করতে গিয়ে বলেছেন পরস্পরাশ্রয় সব সময় দোষের নয়। দুটি বস্তু যদি একই বিষয়ে পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভর করে তবে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়। যে জন্য বেদ ঈশ্বর নির্ভর ঠিক সেইজন্যই যদি ঈশ্বর বেদনির্ভর হতেন তবে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হত। কিন্তু যুক্তিতে সেকথা বলা হয়নি। বেদ ঈশ্বরের সৃষ্টি অর্থাৎ, সৃষ্টির জন্য বেদ ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু ঈশ্বর বেদের সৃষ্টি নয়। ঈশ্বরকে জানার জন্য বেদের উপর নির্ভর করতে হয়। ঈশ্বর নিত্য, তাই ঈশ্বরের উৎপত্তির কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। সুতরাং, নৈয়ায়িকের যুক্তিতে কোন অন্যোন্যাশ্রয় দোষ নেই।